মইরমের ঢেঁকি

হাবিব

ঐতিহ্য

আমার কিছু কথা ছিল
৩

ধ্রুব দা'কে
কারণে, অকারণে

গল্পক্রম

আমার কিছু কথা ছিল ৯
তোমার জন্য, বুবুলটি ১৪
সাইকেল বালক ২৭
আমাদের মহান দায়িত্ব ৫৭
মইরমের ঢেঁকি ৬১
ফেরা না ফেরা ৮২

আমার কিছু কথা ছিল

আমি ক্লাস ছেড়ে চলে এলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ শিক্ষার উপর একটা কোর্স চালু করেছে। দশ সপ্তাহে বিশটা ক্লাস। তার সপ্তম সপ্তাহের আজ প্রথম ক্লাস। ক্লাস শুরু বিকেল সাড়ে তিনটায়। আমি তার আগেই উপস্থিত হয়েছিলাম কলা ভবনের দোতলায়। ঠিক ক্লাস শুরুর আগে চলে এলাম। এসে ভার্সিটির সেন্ট্রাল লাইব্রেরির দোতলায় বসে এই লেখাটা লিখছি।

শুরুটা পড়ে যে কেউ ভাবতে পারেন, আমি নেহাতই একটা গল্প ফাঁদার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমি জানি, এ আমার একান্তই নিজের কথা। তা যে কাউকে বলতে বা লিখতেই হবে, এমন নয়। তবু লিখছি। ইচ্ছে হলে গল্প বলতে পারেন অথবা না। লেখাটা এই বিশেষ সময়ের একটা খণ্ড অনুভূতি হিসেবেই আমার কাছে থাকবে। হয়তো।

আমি চারুকলার প্রথম বর্ষের ছাত্র। ইন্ডিয়ান কালচারাল কাউন্সিলের একটা বৃত্তি নিতে চাচ্ছি। সে জন্য ইংরেজিতে যে টোটাল দক্ষতা প্রয়োজন, তার জন্যই এই ইংরেজি ভাষা কোর্সে ভর্তি হওয়া।

বিশজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রতিটা ব্যাচ। এখানে স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে গৃহিনী, চাকুরীজীবীরাও আছে। এদেরই একজনের নাম নাদিয়া। পুরো নাম জানি না। প্রথমদিন অরিয়েন্টেশন ক্লাসে শুনলেও এখন আর মনে নাই আমার। উজ্জ্বল শ্যামলা আর ছিমছাম চেহারার একটা মেয়ে। আমাদের ব্যাচের সবচেয়ে সুন্দর এবং আকর্ষণীয়া বলা চলে। অন্তত আমার চোখে তাই।

প্রথম থেকেই নাদিয়াকে দেখে একটা ভালো লাগা কাজ করছিল আমার ভেতরে। তা পাত্তা দেয়ার মতো নয় মোটেই। একজন একুশ

বাইশ বছরের যুবকের মনে প্রায় সমবয়সী সুন্দরী মেয়েগুলো দেখলে যেমন হয়। আমি অনেকটা গা এলানো ভঙ্গিতে চলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বেশিদিন তা সম্ভব হলো না। দিনদিন আমার ভেতর ওর উৎপাত বেড়েই চলল। কখনো কখনো তা বাইরেও বেরিয়ে আসতে চায়। যেমন আজ হয়েছে।

এরমধ্যেই একরাতে স্বপ্ন দেখলাম, নাদিয়া খুব সেজে ক্লাসে এসেছে। জীবনে প্রথম শাড়ি পরেছে বলে মনে হলো কোনো উপলক্ষ্য ছাড়াই। তাতে আর কার কেমন অনুভব হলো জানি না। তবে আমার চোখে ধাঁধাঁ পড়ে গেল। এই রঙের শাড়ি ঢাকা শহরের কয়টা মেয়ে পড়তে জানে! কিন্তু আমি কিছুতেই রঙটার নাম মনে করতে পারলাম না। আর আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে নাদিয়া আমার ব্রেঞ্চে এসে বসল সে ক্লাসে।

বাস্তবে নাদিয়া কোনো ক্লাসেই আমার ব্রেঞ্চে বসেনি। কোনো ছেলের সাথেই বসে না। বসে অন্য মেয়েদের সাথে। বোরকাপরা একটা বড়আপু আছে, মাস্টার্সে পড়ে বোধ হয়। বিশেষ করে বসে তার সাথে। খুব ভাবও হয়েছে দেখি ইদানীং। আমি মনেমনে প্রমাদ গুনি, কোনো ছেলের সাথে তো বসছে না নাদিয়া আমার চোখে আঙুল দিয়ে।

টিঙটিঙে চেহারার নিউমেরি নামের একটা ছেলে আছে। গায়ে পড়ে মেয়েদের সাথে খুব ভাব করে দেখি। তাকেও কখনো নাদিয়ার সাথে কথা বলতে দেখিনি। তাছাড়া তিনটা ছেলে আছে এবার এইচ.এস.সি দিয়েছে। আমার সাথে বেশ মিশে। ওদের সাথে তো নয়ই।

যেচে গিয়ে কারো সাথে কথা বলা আমার ধাঁতে নেই। কিন্তু এখন আমার খুব ইচ্ছা করে মেয়েটার সাথে টুকটাক কথা বলি। এই যেমন, কেমন আছেন?.. তা না পারলেও দুই কি তিনদিন নাদিয়ার পেছনের ব্রেঞ্চে বসেছিলাম আমি ইচ্ছে করেই। ঠিক ততটুকু কাছাকাছি, যতটুকু হলে ওর চুলের গন্ধ পাওয়া যায়। ওর ঘাড়ের মাজা রঙ, ঘাড়ের উপরে ছোট ছোট লালচে চুল, আমাকে অন্যরকম ভাবতে তাড়িত করেছিল তখন। কিন্তু নাদিয়া আমার বাহু জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে, এমনটি কখনো ভাবতে চাইনি আমি। আমার ভালোবাসায় এতটুকু কলুষিতা আনতে চাইনি আমি।

কোনো কোনো ক্লাসে নাদিয়া চকিতে তাকায় আমার দিকে। মুহূর্তে আমার বুকটা দুলে উঠে। সেই আশায় প্রতি ক্লাসে এখন এমনভাবে বসি, যেন ইচ্ছে হলেই আমাকে দেখতে পায়। আমি তো কত কৌশলেই ওকে দেখি সুযোগ পেলেই।

তিনঘণ্টার ক্লাসের মধ্যে বিরতি পনেরো মিনিট। নাদিয়া বোরকাপরা আপুটার সাথে বারান্দার এপার থেকে ওপার ধরে হাঁটে। শুধু ওকে দেখার জন্য আমিও জুনিয়র ছেলে তিনটাকে ডেকে নিয়ে হাঁটি। হাঁটতে হাঁটতে কখনো নাদিয়ার মুখোমুখি হয়ে গেলে আমি মাথা নিচু করে ফেলি। ও অদ্ভুত স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে যায়। একদিন বিরতির সময় বাসায় অথবা অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল নাদিয়া। আমি খুব ছটফট করেছিলাম। আগে কেন জানলাম না? তবে আমিও চলে যেতাম তখনই।

কিন্তু এভাবে আর কয়দিন চলে? আমি মনেমনে সিদ্ধান্ত নিই, আর ক্লাস করব না। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরে বৃহস্পতিবার এলে আবার ক্লাসে আসি। একদিন সেই টাঙ্গাইল থেকেও চলে এসেছিলাম শুধু এই ক্লাস করার জন্যই। ভাবা যায়, যে আমি স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে অনিয়মিতের আদর্শ হয়েই ছিলাম সব সময়!

সেদিনও ক্লাস শুরুর আগে আগে আমি ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে চলে এসেছিলাম, কেবল নাদিয়া ক্লাসে না আসার জন্য। তারপর কী একটা কাজের পরে কলাভবনে এসে দেখি, বিরতির সময় বোরকাপরা আপুটার সাথে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে ও! আমি পরের দিন আর ভুল করলাম না। শুক্রবারের সকাল নয়টার ক্লাসের একঘণ্টা আগে এসে বসে থাকলাম। কিন্তু নাদিয়া সেদিন ক্লাসে এল না। আমার কাছে এইটা ঈশ্বরের অবিচার বলেই মনে হলো।

তারপরের ক্লাসই আজ।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠার সাথে সাথে নাদিয়াকে দেখলাম। দুইটা মেয়ের সাথে হেঁটে আসছে। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। ওদের ক্রস করে আসার সময় প্রাণপণ চেষ্টা করলাম বলি, কেমন আছেন আপনারা?

ভেবেছিলাম, অন্তত ওরা বলবে। বলল না। আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। কানে এয়ারফোন লাগিয়ে এমপিথ্রি প্লেয়ারে মৌসুমী ভৌমিকের গান শোনলাম,

'আমার কিছু কথা ছিল
তোমায় বলার
কেবল তোমায়'...

ছেলে তিনটা এল। ওদের এইচএসসি'র রেজাল্ট জানাল। নাদিয়া আসলে কোন ক্লাসে পড়ে আমি তখনও নিশ্চিত ছিলাম না। একদিন

বোধহয় বলেছিল ক্লাসে। আমি ওর চুলের গন্ধে বিভোর ছিলাম বলে শুনতে পাইনি। মেয়েটা খুব আস্তে কথা বলে।

আমি মূলত নাদিয়ার কথা জানতে চেয়েই জিজ্ঞেস করলাম, আর কেউ পরীক্ষা দেয়নি আমাদের ব্যাচে?

ওদের একজন বলল, দিয়েছে। নাদিয়া, বোরকাপরা আপুটার সাথে বসে।

ওর রেজাল্ট জানো তোমরা?

না। রেজাল্টের পর তো আর দেখাই হয় নাই। আজ জানা যাবে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বুকের ভেতর পুরনো ব্যথাটা এখনও গড়াগড়ি দিচ্ছে। ওদের রেখেই হাঁটতে শুরু করলাম বারান্দা ধরে। এবারও নাদিয়াকে দেখলাম, সিঁড়ি থেকে দোতলায় ওঠার সাথে সাথে। আবার একই জায়গায় ক্রস করে এলাম ওদের। এবার আর ওর দিকে তাকালাম না আমি।

তারপর এখানে এসে লিখছি।

লেখাটা এই পর্যন্ত যারা পড়ে ফেলেছেন এনিহাউ, তারা কে কী ভাবছেন, আমি জানি না। জানতেও চাই না। আমার খুব প্রিয় চন্দ্রবিন্দু'র একটা গানের লাইন আছে, গোপন ইচ্ছেরা গুপ্তধন। তেমনই এই লেখাটাও আমার গুপ্তধন। যাকে আমি আমার এই নোটবুকের সিন্দুকে লুকিয়ে রাখছি আপাতত।

আমি আগেই বলেছি, লেখাটা আমার একটা খণ্ড অনুভূতি মাত্র। একটা বয়সে যা অধিকাংশ মানুষের জন্যই অপরিহার্য হয়ে উঠে হয়তো। কারো বেলায় তা পূর্ণতা পায়। কারো কারো পায় না কখনোই। আমি নিজেও এর প্রমাণ রেখেছি অলরেডি কয়েকবার। তাদের অনেককেই একেবারে ভুলে গেছি। কাউকে কাউকে হয়তো যাইনি। তাদের মাঝে নাদিয়াকে আলাদাভাবে কতদিন মনে রাখতে পারব কে জানে!

বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য পড়ুয়াদের মনে সারাক্ষণ কী রঙ লেগে থাকে, আমি জানি। নিজেকে এর ব্যতিক্রম দাবি করার সাহস আমার নেই। দাবি করিও না। তারপরও মাঝেমাঝে মনে হয়, নাদিয়াকে যদি সারা জীবন পাশে রাখতে পারতাম। সত্যিই সারা জীবনের জন্য!

একবার মনে হলো, আমি অন্তত চেষ্টা করে দেখি না কেন? বোরকাপরা আপাটাকে তো অনায়াসেই বলা যায়। একটু গোপনে।

ভাবলাম, কারো সাথে নাদিয়ার প্রেম থাকাও অস্বাভাবিক না। কিংবা না থাকলেও আমাকেই হয়তো পছন্দ হলো না ওর। সেক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হবার লজ্জায় ক্লাস একেবারেই ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনাও আছে আমার। এই যা। সে অভিজ্ঞতাও আমার আছে বেশ।

আবার ভাবলাম, যেভাবে চলছে চলুক না। স্বইচ্ছায় কয়জন পারে এমন অদৃশ্য আগুনে জ্বলতে? কিংবা এই লেখাটাই ওকে পড়তে দিয়ে দেখা যায়, ও কী করে!

আমি চাইলে কালই তা সরাসরি নাদিয়ার হাতে দিতে পারি। ক্লাস শেষে চলে যাবার সময় পেছন থেকে ডাকব, নাদিয়া একটু শুনবে?

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, তোমাকে।

একটু নীরবতা। তারপর আমি ইতস্তত করে বলব, আমার কিছু কথা ছিল তোমাকে বলার, নাদিয়া।

কী কথা? বলুন!

আমি তখন এই লেখাটা ওকে দেখিয়ে বলব, এইটা কোনো প্রেমের চিঠি না, জাস্ট একটা গল্প। তুমি একবার পড়ে দেখবে নাদিয়া?

তারপর নাদিয়া হয়তো আমার হাত থেকে কাগজ কয়টা নেবে। কিংবা নেবে না। পৃথিবীর অলৌকিক নারীদের মতো নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হেঁটে চলে যাবে বারান্দা ধরে।

দৃশ্যটা বাস্তবে দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

দুই হাজার পাঁচ

তোমার জন্য, বুবুলটি

আমার নাম বুবুলটি।

শুনলেই মনে হয়, যেন একটা পাখি। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে? ছোটবেলায় পড়া সেই ছড়াটার কথা মনে পড়ে আমার। মনে পড়ে বুলবুলি পাখিটির কথা। অনেকে আবার সুর করেও ডাকে, বুল-বুল-টি-ই। কিন্তু সবার মুখে এই নাম আমার ভালো লাগে না। তাই নতুন কেউ নাম জানতে চাইলে, আমি ছোট করে বলি, বুবুল। শুনে অনেকে অবাক হয়, এ কেমন নাম! আমি তখন মনেমনে বলি, খুব পচা নাম। তাতে তোমার কী?

মনেমনে কথা বলাটা আমার একটা অভ্যাস। আমার আর যে কয়টা অভ্যাস আছে, তার মধ্যে এইটা সবচেয়ে প্রবল। বুঝতে পারার পর থেকে কিছুদিন বিরক্ত লাগত। এখন আর লাগে না। ভালো না লাগলেও সারাক্ষণ মনেমনে কিছু না কিছু বলতেই থাকি আমি। যেমন এখনো বলছি। হয়তো প্রতিটা মানুষই সারাক্ষণ মনেমনে কিছু না কিছু ভাবতে থাকে। কথাও বলে মাঝেমধ্যে। তবে আমার ব্যাপারটা আরও জটিল।

জটিল এই জন্য যে, আমার কেবল মনেমনে কথা বলতেই ভালো লাগে। মুখে কথা বলতে ভালো লাগে না। প্রায় সময়ই কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও আমি মনেমনে উত্তর দিয়ে বসে থাকি। আর তারা ভাবে, আমি হয়তো বোবা কিংবা অহঙ্কারী। আমি তাদের মনেমনে ভাবনাটাও বুঝতে পারি। এখন মনে হয়, মনেমনে কথা বলতে আর বুঝতে পারাটাই আমার অহঙ্কার। পারলে তোমরাও বলো। বুঝতে চেষ্টা করো। তাতে অন্তত পৃথিবীর শব্দ দূষণ কিছুটা কমবে।

পৃথিবীতে মাত্র একজন মানুষই বুঝতে পারত আমাকে। সে আমার বাবা। আমি মনেমনে কখন কী ভাবছি বা বলছি, বাবা আমার চোখের

দিকে তাকিয়েই বুঝে ফেলত। প্রথম প্রথম সে যেগুলো বুঝতে পারত, সেগুলো আবার পরীক্ষা করার জন্য আমাকে মুখে বলত। মিলে গেলেই আমি মাথা দোলাতাম। পরবর্তীতে বাবাও আর আমাকে মুখে কিছু বলত না। কারণে অকারণে আমরা দুইজন দুইজনের সাথে মনেমনে কথা বলতাম। ধীরেধীরে আমরা একজন আরেকজনের সামনে না থাকলেও, কে কি ভাবছি বা বলছি, ঠিকই বুঝতাম। আমরা জানতাম, এইটা শুধুমাত্র ট্যালিপ্যাথি না। অ্যানাদার কানেক্টিভিটি।

মার সাথে কখনো আমার এই যোগাযোগ তৈরি হতো কি না, আমি জানি না। কারণ মা আমাকে জন্ম দেবার সময়ই মরে গেছে। ছোটবেলায় আশপাশের মানুষদের কাছে শুনতাম, আমি মা মারা মেয়ে। অলক্ষ্মী। তারও আগে, আমার বয়স যখন কয়েক বছর হয়ে গেছে কিন্তু আমি কথা বলি না, তখন গ্রামের সেই মানুষগুলার পরামর্শেই দাদি আমার মুখে কথা ফুটানোর জন্য অনেক কবিরাজি তাবিজ কবজ করেছিল।

বাবার এইসবে বিশ্বাস ছিল না। সে ছিল প্রচণ্ড যুক্তিবাদী মানুষ। আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করত বাবা। সৎ আর যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে গ্রামের সবাই তাকে মান্য করত। সালিশ বিচারে ডাকত। বিপদে আপদে সাহায্য আর পরামর্শ চাইত। দাদির মৃত্যুর পর তাদের আব্দারেই বাবা আমার সৎ মাকে বিয়ে করে আনে। তখন আমার স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমি পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

বাবা ছাড়া আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমি টাঙ্গাইল জেলায় সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে বৃত্তি পাই। এরপর, বাবা মুখে না বললেও, আমি জানি, সৎ মার প্রভাবের ভয়েই আমাকে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী গার্লস স্কুলের হোস্টেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে এসএসসি পাসের পর ভারতেশ্বরী হোমস। তারপর এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিকস ডিপার্টমেন্ট।

মেধাবী হিসেবে প্রাপ্ত বৃত্তি থেকেই আমার পড়াশোনার বেশির ভাগ খরচ মিটে যেত। তবু বাবা সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকত, আমি কখন কিসের অভাব ফিল করি। তাই ব্যাংকে আমার নামে ডিপোজিট করে রেখেছিল। আমার পড়তে ভালো লাগত বলে রাজ্যের বই কিনে আনত। বাবা জানত, শব্দ ছাড়া একমাত্র ছবি কথা বলে। সেজন্য আমি ফটোগ্রাফি পছন্দ করি। তাই ক্যামেরা কিনে দিয়েছিল ফার্স্ট ইয়ারেই। পরবর্তীতে ফটোগ্রাফির জন্য কয়েকটা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছি আমি। ভার্সিটির ভাইভা পরীক্ষাগুলোর